# পর্যবেক্ষণ

সংবাদ বিশ্লেষণ ● মানবিক স্বার্থভিত্তিক প্রতিবেদন ● সমস্যাকেন্দ্রিক সংবাদ কাহিনি

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ভবন। ছবি - প্রতিবেদক

## কথামতো হাসপাতাল ভবন না পেয়ে ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্তারা

**তপনকুমার বিশ্বাস ● ইসলামপুর**

দুই বছর আগে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের দ্বিতল ভবন পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। ভবনটি এখনও না পাওয়ায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পূর্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে। ২০০৮ সালে শুরুতে দ্বিতল ভবনের নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। কবে তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে তা কেউ জানেন না। স্বাস্থ্য দপ্তর কবে পাবে ভবনটি তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। অথচ হাসপাতালে শয্যার বা জায়গার অভাবে মহিলা ও প্রসূতি বিভাগের রোগীরা মেঝেতে শুয়ে থাকেন।

রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী আনওয়ারুল হক আশ্বাস দিয়েছিলেন, ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর মহানন্দা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। হাসপাতালের দ্বিতল ভবনের কাজ শেষ হয়নি। এ ব্যাপারে ক্ষোভ ব্যক্ত করে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতা ডাঃ তবিবুর রহমান বলেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার কাজের তদারকির প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই কাজ এখনও শেষ হয়নি। রাজ্যের মন্ত্রী আব্দুল করিম চৌধুরি হাসপাতালের ভবনের কাজ শীঘ্রই শেষ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে না পারার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি। সিপিএম ও কংগ্রেস নেতৃত্বও ভবনটির কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিধান মিশ্র জানান, বহুদিন ধরেই পূর্ত দপ্তর হাসপাতালের দ্বিতল ভবনটি আমাদের হস্তান্তর করার কথা বলে আসছে। আমরা কবে দ্বিতল ভবন ব্যবহার করতে পারব, তা জানি না। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারার জন্য তিনি পূর্ত দপ্তরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

পূর্ত দপ্তরের ইসলামপুর মহকুমার সহকারী বাস্তুকার সুজিত দাস জানান, আশা করা যায় চলতি মাসের শেষের দিকে হাসপাতালকে দ্বিতল ভবনটি হস্তান্তর করা যাবে। এছাড়া মহিলা বিভাগের উপরে দ্বিতল ভবনের একটি অংশ শীঘ্রই দিয়ে দেওয়া যাবে। সিঁড়ির কাজ কিছু বাকি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কে তিনি জানান, ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু ব্যবস্থা নিতে গেলে কাজ আরও পিছিয়ে যেত।

## দলমোড় চা বাগানে ১০০ দিন প্রকল্পে কাজ করতে রাজি নন শ্রমিকরা

**অলোক গুহ ● বীরপাড়া**

২৫ নভেম্বরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তি ১ ডিসেম্বরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিক নেতারা মানতে না চাওয়ায় ডুয়ার্সের বন্ধ দলমোড় চা বাগান নিয়ে বৈঠক আরও একবার ভেস্তে গেল।

১ ডিসেম্বর ডিবিআইটি-এর দপ্তরে ডুয়ার্সের বন্ধ দলমোড় চা বাগান নিয়ে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে ২৫ নভেম্বরের শিলিগুড়িতে জয়েন্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি বৃহস্পতিবারের বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা মানতে না চাওয়ায় বৈঠক ভেস্তে যায় বলে জানান ডিবিআইটি-র পক্ষে সঞ্জয় বাগচি।

সঞ্জয় বাগচি টেলিফোনে জানান, গত ২৫ নভেম্বর শিলিগুড়িতে জয়েন্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। পরবর্তীতে ওইদিনই মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে ঠিক হয়, বাগানে ৬০ দিন এনআরইজিএস (১০০ দিনের কাজের প্রকল্প) প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ হবে এবং ৯৪১ জন শ্রমিক কাজ করবে। যদিও শ্রমিক সংগঠনের দাবি ছিল ১০২১ জন শ্রমিককে কাজ দিতে হবে। এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিক হয়, বাগান ২৯ নভেম্বর খুলবে। শ্রমিক সংগঠন ৯৪১ জন শ্রমিকের নামের তালিকা বাগান কর্তৃপক্ষকে জমা দেবে। কিন্তু শ্রমিকদের নামের তালিকা জমা না পড়ায় এবং মালিকপক্ষ বাগানে উপস্থিত না হওয়ায় বাগান খোলেনি। বাগান খোলার বিষয় নিয়ে ১ ডিসেম্বর ডিবিআইটি-এর দপ্তরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের দাবি মতো ১০২১ জন শ্রমিক সংখ্যা মেনে নেওয়া হয় কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক সংগঠন এনআরইজিএস প্রকল্পে বাগানে কাজ হবে না বলায় বৈঠক ভেস্তে যায়।

এ বিষয়ে শ্রমিক প্রতিনিধি দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গোবিন্দ প্রধান বলেন, বাগানের শ্রমিকরা এনআরইডিএস প্রকল্পে কাজ করতে রাজি হয়নি। ফলে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও মানা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি বাগানের শ্রমিকদের দায়ী করেন। তবে তিনি চান বাগান খুলুক।

## প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধে পুলিশি অভিযান দাবি

**বিশ্বজিৎ সাহা ● মাথাভাঙ্গা**

নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে মাইকে প্রচার চালাতে হবে। মহকুমার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পুরসভাগুলিকে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে নির্দেশিকা জারি করতে হবে। অবৈধ প্লাস্টিক মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে এবং মহকুমাজুড়ে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধে এবং উদ্ধার করতে পুলিশি অভিযান চালাতে হবে। দাবিগুলি মাথাভাঙ্গার পরিবেশপ্রেমী সংস্থা গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশনের। সংস্থাটির পক্ষ থেকে মাথাভাঙ্গাজুড়ে যথেচ্ছভাবে বেআইনি প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের ঘটনায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

সংস্থার সভাপতি তাপস বর্মন অভিযোগ করেন, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের 'রেস্ট্রিকশন অন ইউজ অফ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগস্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' মাথাভাঙ্গা মহকুমায় লঙ্ঘিত হচ্ছে। তার আরও অভিযোগ, প্রশাসনিক উদাসীনতায় ব্যাপকহারে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার চলছে মহকুমাজুড়ে। এর বিরুদ্ধে সংস্থার লাগাতায় আন্দোলন চলবে বলে তাপসবাবু জানান।

# আইনের প্রয়োগ নেই, বুক ফুলিয়ে মাছ নিধন করছে দুর্বৃত্তরা

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**রাঙ্গালিবাজনা ঃ** বিষ প্রয়োগ করে মৎস্য নিধন যজ্ঞের দাপটে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির সুস্বাদু মাছ। বেশকিছু প্রজাতির মাছ ইতিমধ্যেই নদীর বুক থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বেআইনিভাবে মৎস্য নিধনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলেই বুক ফুলিয়ে ওই বেআইনি কাজ চালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা, অভিযোগ মৎস্যপ্রেমী ও পরিবেশপ্রেমীদের। বিষ প্রয়োগে মৎস্যকুলের অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে তাই নয়, বিষক্রিয়ায় মরা মাছ খাওয়ার ফলে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে মানুষের শরীরেরও।

'মাছে ভাতে সুখী' বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে একসময় নানা জাতের সুস্বাদু মাছের জোগান দিত উত্তরবঙ্গের নদীনালাগুলি। তিস্তা তোর্সার বোরলি মাছের অপূর্ব স্বাদের স্মৃতির রোমন্থনে এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন প্রবীণ বাঙালিরা। শোল, বোয়াল ইত্যাদি মাছ তো বর্তমানে বাজারে খুন কমই দেখা যায়। ব্যাপকহারে কমে গেছে খট্টি, পুঁটি, ঘাকসি, পেন্টি, খাটা, দাড়িকা, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছ। হাইব্রিড পদ্ধতিতে চাষ করা ট্যাংরা মাছ দিয়ে বর্তমানে অনেকে 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো'-র চেষ্টা করেন।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে বিষপ্রয়োগ করে ব্যাপকহারে মাছ ধরা এক প্রকার অপসংস্কৃতি উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে চৈত্র সংক্রান্তির রাতে কোনো না কোনো নদীতে তো বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরা হয়ই। এবছর ১৪ জুন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের মুজনাই নদীতে বিষ প্রয়োগ করায় কয়েক মাছ মারা যায়। কিন্তু ওই অপরাধের কোনো কিনারা হয়নি। আর হবেই বা কি করে। মৎস্যপ্রেমী ও মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের কানে পৌঁছালেও কোনো তদন্ত হয়না। স্বাভাবিকভাবেই নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ হত্যা করা যে দণ্ডনীয় অপরাধ তা জনগণ ভুলেই গেছে। গত সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া করলা নদীতে বিষক্রিয়ায় মারা যায় বহু কুইন্টাল মাছ। করলা নদী শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। এক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসনের টনক নড়েছে, কারণ বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে কানেও পৌঁছেছে। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু জলপাইগুড়ির ঘটনাটি নিয়ে যতই হইচই হোক, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ঘটনাগুলি নিয়ে পুলিশ-প্রশাসন কোনো গা করে না। নদীতে বিষ প্রয়োগ করায় শুধু যে মাছই মারা যাচ্ছে তা নয়, মাছের সঙ্গে নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির অন্যান্য জলজ প্রাণীও। মাছের সঙ্গে তাই ব্যাপকহারে কমে গিয়েছে নানা প্রজাতির কাঁকড়া, শামুক, কুঁটে ইত্যাদি। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

নদীতে বিষ প্রয়োগের জন্য রাতের অন্ধকারকেই বেছে নেয় দুর্বৃত্তরা। চটের বস্তা বিষে ভিজিয়ে নদীতে নেমে তা পায়ের সাহায্যে চেপে ধরে কয়েকজন। এদিকে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা ২-১ কিমি দূরে আগেভাগেই নদীতে জাল পেতে রাখে। ফলে প্রচুর পরিমাণে মাছ জমা হয় তাদের জালে। ভোরের আলো ফোটার আগেই সেই মাছ চলে যায় বাজারে। কিন্তু জলে মিশে যাওয়া বিষ ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত। প্রচুর মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনহানি ঘটে।

বিভিন্ন এলাকার গ্রামাঞ্চলগুলিতে ঘুরে জানা গিয়েছে, কে বা কারা নদীতে বিষ প্রয়োগ করে তা ওই এলাকায় ওপেন সিক্রেট। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যেহেতু পুলিশ-প্রশাসন মাথা ঘামায়না, তাই এসব দুর্বৃত্তদের নাম পুলিশ-প্রশাসনের গোচরে এনে কেউ আর শত্রু বাড়াতে চায় না। প্রতি বছর তাই বিষ প্রয়োগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে। নদীতে বিষপ্রয়োগের ঘটনায় কেবল বাঙালির রসনাতেই টান পড়েনি, টান পড়েছে মৎস্যজীবীদের রুজিতেও। অনেক মৎস্যজীবী বর্তমানে বংশপরম্পরায় পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই বাজারে দেশি নদীয়ালি মাছের জন্য হা-পিত্যেশ করতে হয়। জিভে জল আনা খট্টি, বোরলি, বোয়ালের জায়গায় তাই বাঙালির পাতে উঠে এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা হাইব্রিড পদ্ধতিতে চাষ করা রুইমাছ।

শুধু বিষপ্রয়োগই নয়, বেআইনিও বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটিয়ে ব্যাপকহারে মারা হচ্ছে মাছ। মৃত্যু হচ্ছে জলজ প্রাণীদেরও। হুকিং করে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতেই গত দু-বছরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন তিনজন।

ক্রমশ কমে আসছে জলাভূমি। শহর ঘেঁষা জলাভূমিগুলি ভরাট করে গড়া হচ্ছে আবাসন। ফলে শিঙি, মাগুর, কই, শাঁটি ইত্যাদি জিওল মাছ সংকটের মুখে। শখের মৎস্যশিকারিরা তাই আজকাল ছিপ নিয়ে সরকারি পুকুরে টিকিট কেটে মাছ ধরতে যান। বুধবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জলপাইগুড়ির করলা নদীতে মাছের মড়কের কারণ জানা না গেলেও বিষ প্রয়োগের আশঙ্কা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। আবার আবর্জনা নদীতে ফেলায় তা থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হওয়ায় মাছের মৃত্যু হতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন তারা। তবে মাছের মৃত্যুর কারণ যাইহোক না কেন, মৃত্যুর কারণ মানুষেরই সৃষ্ট বলে সবাই একমত।

অবলীলায় মাছ নিধন চলছে। ছবি - প্রতিবেদক

### সরকারি কাজের কোনও তথ্য নেই

# কোচবিহারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যেন ঠুঁটো জগন্নাথ

**সুশান্ত গুহ ● কোচবিহার**

মৃত্যুদূত মাথার ওপরে। প্রাণের দায় বড়ো দায়। তাই প্রাণ বাঁচাতে কোচবিহারে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক তার চেম্বার বদল করে অন্য ঘরে সরে গেলেন।

কোচবিহার শহরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অফিসের ছাদ থেকে মাঝে মাঝেই চাঙড় খসে পড়ছে। অফিসার ও অন্য কর্মীরা আতঙ্কিত। গত ১৮ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে এই বাড়িতে আর অফিস করতে সাহস পাচ্ছেন না কেউ। সরকারি অফিস বলে কথা। তাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক তপন তরফদার ওই ভগ্নদশার বাড়িতেই তার চেম্বার অন্য ঘরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও হেলদোল নেই।

রাজ্য সরকারের সুস্বাস্থ্যের কথা যাদের জনগণের কাছে তুলে ধরার কথা সেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কোচবিহারের জেলা অফিসের স্বাস্থ্যের কথাই তো অমৃত সমান।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কোচবিহার অফিসে ২টি গাড়ি ছিল। কাগজে-কলমে আছেও। গাড়ি দুটো এখন আর ওজন দরেও কেউ নিতে রাজি নয়। বহু বছর ধরে গ্যারেজে পড়ে রয়েছে অচল হয়ে। অফিসে কর্মীসংখ্যা একেবারেই কম। যারা আছেন তাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণির (ডি গ্রুপ) সংখ্যাই বেশি। অফিসে কাজের পরিবেশের অভাব। কোচবিহার জেলায় নানা সরকারি অনুষ্ঠান হচ্ছে। মন্ত্রীরা আসছেন, যাচ্ছেন। মজার ব্যাপার, কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে কোনও খবর নেই। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রয়েছে সমন্বয়ের অভাব। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে বিদেয় হওয়া বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি লাটে ওঠে। শাসক দলের নিয়ন্ত্রণেই চলত দপ্তরের কাজ। শাসন ক্ষমতার পালা বদলের পরেও সেই বিশুদ্ধ ধারাই চলছে বলে অনেকের ধারণা।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক তপন তরফদার সোমবার কথা প্রসঙ্গে জানান, কোচবিহারের এই অফিসবাড়ি বদলের জন্য তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি অনুমতি চেয়েছেন গ্যারেজে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া ২টি অচল গাড়ি নীলাম করে দেবার জন্য। সেই সঙ্গে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়েছেন কোচবিহার জেলাজুড়ে দপ্তরের কাজকর্ম করার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি। এদিকে, নিন্দুকেরা বলাবলি করছে, কোচবিহারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সারা বছরের কাজ হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসে সর্বধর্ম সভা করা। তথ্য দপ্তর হচ্ছে রাজ্য সরকারের মুখপাত্র। রাজ্য সরকারের সুস্বাস্থ্যের কথা ঢোল পিটিয়ে এদের জনগণের কাছে তুলে ধরার কথা। কিন্তু সরকারি উদাসীনতায় এই দপ্তরের কোচবিহারের অফিস আজ নিজেরাই খবর হয়ে উঠছেন।

কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

নিশিগঞ্জে নির্মাণাধীন বহুমুখী হিমঘর। ছবি - প্রতিবেদক

## নিশিগঞ্জে তৈরি হচ্ছে বহুমুখী হিমঘর

**তাপস মালাকার ● নিশিগঞ্জ**

নিশিগঞ্জে তৈরি হচ্ছে বহুমুখী হিমঘর। রাজ্য বিপণন পর্ষদের অর্থানুকূল্যে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিশিগঞ্জ নতুন বাজারে হিমঘরটি তৈরি হচ্ছে। এই হিমঘর বহু কৃষকের কল্যাণ করবে। এই বহুমুখী হিমঘরের মালখানায় কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য রেখে বাজার দর দেখে বিক্রি করতে পারবেন।

উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অসমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাইকাররা এই হাটে মাল কিনতে আসেন। এলাকার আর্থিক বিকাশে নিশিগঞ্জহাটের বিরাট ভূমিকা আছে। কোচবিহার জেলার অন্যতম বৃহৎ হাট হিসেবে পরিচিত নিশিগঞ্জহাট। এই হাটে পণ্যের আমদানি বেশি হলে এমনি দাম পড়ে যায়। এতে কম মূল্যেই কৃষকরা পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন। কারণ শাকসবজি রেখে দেওয়া যাবে না। কিন্তু নিশিগঞ্জ নতুন বাজারের হাটের পাশে এই হিমঘরের সুযোগ নিতে পারবেন এই এলাকার কৃষকরা। তাদের উৎপাদিত শাকসবজি বাজার দর দেখে বিক্রি করতে পারবেন।

মাথাভাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি সূত্রে জানা গেছে, নিশিগঞ্জ বাজার চত্বরকে আদর্শে পরিণত করতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তৈরি হয়েছে নতুন কয়েকটি শেড ও পাকা স্টল। বহুমুখী হিমঘরটির নির্মাণকাজও প্রায় শেষের দিকে। এই হিমঘরটি চালু হলে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।

# নতুন উদ্যমে হরিরামপুর ব্লকে একশো দিনের কাজ শুরু

**সৌরভ রায় ● হরিরামপুর**

জেলার পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলির অন্যতম হরিরামপুর। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। কৃষিপ্রধান এলাকা হলেও গরিব মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বহু মানুষ কাজের খোঁজে বাড়ি ছেড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যান মূলত শ্রমিকের কাজে। ঘরের ছেলেরা যাতে ঘরেই থাকেন, আবার কাজ পান সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এনআরইজিএ প্রকল্প বা একশো দিনের কাজ শুরু করে। বছরে ন্যূনতম একশো দিন যাতে কাজ পায় গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষ এটাই লক্ষ্য। ধুমধাম করে কাজ যারা করবে তাদের জন্য তৈরি হয় জবকার্ড। এর থেকে বাদ যায়নি হরিরামপুর ব্লক। আশার আলো জুগিয়েছিল বহু মানুষের মনে। সরু বা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় মাটি ভরাট করা, মাটির নতুন রাস্তা তৈরি, পুকুর খনন, উঁচু জমি কেটে সমতল করা, রাস্তার পাশে কোনো পুকুর থাকলে পুকুরের পাড় বাঁধাই, নতুন জলাধার তৈরির কাজ শুরু হয়। ব্লকের ছটি পঞ্চায়েত মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার মানুষ জবকার্ড তৈরি করেন। সবখানেই বেশিসংখ্যক মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিও ঢুকে পড়ে ওই প্রকল্পে। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যাকে একেবারে পুকুর চুরি বলা যায়। বন্ধ হয়ে যায় প্রকল্পের কাজ। একমাস বা দুইমাস নয়, বন্ধ থাকে কুড়ি মাস। এনআরইজিএ প্রকল্প বা একশো দিনের কাজ আবার হরিরামপুর ব্লকে চালু হবে এমনটা কেউ ভাবতে পারেনি। কারণ দুর্নীতির সঙ্গে বেশকিছু গ্রামের মানুষ জড়িয়ে পড়েন। তার ওপর আরও বেশি করে যে সমস্যাটা সামনে আসে সেটা হল মাটির সমস্যা। বছরের আমন ধান উঠে যাবার পর আগে বেশিরভাগ জমি অনাবাদি থাকত। এখন আর তা হয় না। বিশেষ করে হরিরামপুরে। এখন ধান উঠে যাবার পর গম ও বোরো ধান লাগানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েন মানুষ। মাটির অভাবেও কাজ করা যায় না। সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে আবার এনআরইজিএ প্রকল্পে একশো দিনের কাজ চালু করলেন বর্তমান বিডিও সামসুর রহমান। পুণ্ডরী, বৈরাঠ্যা, শিরশি পঞ্চায়েত শুরু করেছে কাজ। বাকি পঞ্চায়েতগুলো শুরু করবে। গ্রামের মানুষ জমির মাটি দিচ্ছেন। ওই প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে শেষ হয়নি তদন্ত। এখনও সিআইডি দল আসছে। তার মাঝেই আবার নতুন করে নতুন উদ্যমে হরিরামপুর ব্লকে একশো দিনের কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছে হরিরামপুরের মানুষ।

হরিরামপুর ব্লকে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প চলছে। ছবি - প্রতিবেদক